OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 862 - 871
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ব্রহ্মবাদ প্রসঙ্গে উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের ধারণা : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

শেখ মোঃ মাকতুবুল ইসলাম
এম. ফিল (দর্শন)
Email ID : skmdmaktubul@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Rabindranath, Brahmanism, Upanishad, Jivan Devata, Monism, Dualism, God, Reality, Brahman, Vedas.

Abstract
Rabindranath Tagore was familiar with the Upanishads from his childhood. The main theme of the Upanishads is Brahman. We find the concept of Brahmanism (Brahmabāda) in Rabindranath's thought which was influenced by the Upanishads. Sometimes Rabindranath explained Brahman as in the Upanishads and sometimes he also presented the concept of Brahman in a new way with his own thoughts. Like the Upanishads, Rabindranath searched for a hidden entity in Nature. Through a deep love relationship he found that the entity in his ownself is called 'Jivan Devata'. According to Tagore, the universal entity can be manifested in two stages: firsty the entity is the all-pervasive hidden governing power, the manifestation of the actions of it. Secondly, it is revealed through the love relationship with the individual, like the Jivan Devata of the souls. The Manifestation of the work of universal entity means to act for others by being humane towards the universe. From these Rabindranath developed the theory of Humanism. There is a difference between the thoughts of Rabindranath and the Upanishads on the Jivan Devata. We find the concept of Jivan devata in the thoughts of Rabindranath, where we cannot find that in the Upanishads. Rabindranath pays more importance to the path of devotion (bhakti Marg), where the Upanishads pays the path of knowledge (gyan Marg). We will also find more importance of dualism than monism in Rabindra Darshan. In this context Dualism he gave much importance to the mind in composing the external world. Like the Upanishads, Rabindranath believed that Nirguna Brahma created the world in order to get pleasure. In this way, we will try to present that Rabindranath's Brahmanism is not completely like that of the Upanishads and also not like the theories of Vedantic philosophers. In short, in our opinion we can assume Rabindranath's concept of Brahman as a distinct Brahmanism.

Discussion

বৈদিক যুগ, উপনিষদীয় যুগ এবং বৌদ্ধ যুগ- এই তিনটি যুগকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবন অতিবাহিত হয়। সম্ভবত উপনিষদীয় যুগের প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল বেশি। পিতৃসূত্রে উপনিষদীয় বাণীর প্রতি কবির প্রাক-শৈশব থেকে পরিচয় শুরু হয়। পরবর্তীকালে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ ক'রে উপনিষদের বাণী হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর মানসবৃত্তি শুধুমাত্র উপনিষদের দ্বারা গঠিত হয়নি। উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির প্রকৃতি প্রেম, মানুষের সান্নিধ্য, জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা ও বিচারবোধ। উপনিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল ব্রহ্ম। তাই উপনিষদকে ব্যাপক অর্থে ব্রহ্মবিদ্যাও বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করেছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে গভীর যোগের মাধ্যমে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও মাধুর্যের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। প্রাথমিকভাবে যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, নিখিল ভুবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, সেই দেবতাকেই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম বলেছেন। অবশ্য যতই তিনি তাঁর সাধন জীবন অতিক্রম করেছেন, ততই তাঁর ব্রহ্ম বিষয়ক চিন্তাভাবনা পরিপক্ক হয়েছে। কখনও ব্রহ্ম বিষয়ক উপনিষদের বাণীকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে উপনিষদের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আবার কখনও গভীর মননে নিজস্ব ব্যঞ্জনা ব্যবহার করে ব্রহ্ম বিষয়ক বাণীকে আপন চিন্তাভাবনার পথে ব্যাখ্যা করেছেন। এই নিবন্ধে আমরা মূলত রবীন্দ্র চিন্তায় (প্রবন্ধ, সঙ্গীত ও কবিতা) ব্রহ্মের স্বরূপ কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা নিয়েই আলোচনা করব। সেই সঙ্গে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিষয়ে পর্যালোচনা করবো। সবশেষে আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করব যে, ব্রহ্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে উপনিষদ ও বেদান্তের প্রভাব থাকলেও তাঁর ব্রহ্মবাদকে স্বতন্ত্র ব্রহ্মবাদ হিসেবে গণ্য করা যায়।

সমগ্র আলোচনাটি কয়েকটি পর্বে ভাগ বিন্যস্ত হবে। প্রথম পর্বে আমরা এটা দেখার চেষ্টা করব যে, রবীন্দ্রনাথ কিভাবে উপনিষদ ও ব্রহ্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে আমরা সংক্ষেপে ব্রহ্ম বিষয়ক উপনিষদের ভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। তৃতীয় পর্বের আলোচ্য বিষয় হবে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা কিভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে (প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে এক লুক্কায়িত সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। দ্বিতীয় ধাপে এই মহাসত্তাকে জানতে চেয়েছেন এবং তৃতীয় ধাপে ভালোবাসা দিয়ে এই বিশ্বসত্তাকে নিজের করে পেতে চেয়েছেন। চতুর্থ ধাপে তিনি নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম নয় বরং ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে নিজের অন্তরে স্থাপন করে তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন - যা জীবনদেবতা নামে পরিচিত)। চতুর্থ পর্বে আমরা দেখব ব্রহ্ম বিষয়ে উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। উপসংহারে এটা বলার চেষ্টা করা হবে যে, ব্রহ্মবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এক স্বতন্ত্র ব্রহ্মভাবনা।

উপনিষদ ও ব্রহ্মবাদেরপ্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ : সংস্কৃত পণ্ডিত গৌরিনাথ শাস্ত্রীর মতে, শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা বিশ্বের মহান মহান চিন্তাবিদরা উপনিষদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধন জীবনের প্রথমেই উপনিষদের ব্রহ্মবাদের প্রতি অলক্ষ্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে এ বিষয়ে প্রভাবিত করতে পারেনি। নিজস্ব চিন্তাভাবনার পথে চলতে চলতে তিনি বৈদিক পূর্বপুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হন।'[১] ০উপলব্ধির পথে তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গে কখনো উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার কখনো তিনি উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদ থেকে সরে এসেছেন। তাঁর সাধন জীবনের চিন্তা উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে কেন্দ্রকরে শুরু হলেও পরবর্তীতে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাঁর চিন্তা প্রবাহ কিছুটা ভিন্ন দিকে ধাবিত হয়েছে। উপনিষদের প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেননি। সাধনার অগ্রগতির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনায় কখনো দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ এবং সর্বেশ্বরবাদের ভাবনাও উঠে এসেছে।

উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কয়েকটি কারণ আমরা আলোচনা করব। প্রথমত তিনি পিতৃসূত্রে ঈশ্বর বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিক পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একেশ্বরবাদের ভক্ত ছিলেন। পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে বিগ্রহ পূজার রীতিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রহণ করতে পারেননি বলেই রাজা রামমোহন রায়ের মতো নিজস্ব 'ব্রহ্মধর্মে'র পরিকল্পনা করেন। অবশ্য উপনিষদীয় ভাবনা যেখানে মানুষকে ব্রহ্ম বলে কল্পনা হয়, এমন নীতি থেকে তিনি তার ব্রহ্মধর্মকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। এমন একটা আধ্যাত্মিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে পূজার্চনার ব্যবস্থা ছিল।

এভাবে তাঁর ঈশ্বর ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তার লাভ করেছিল। তবে তিনি পৌরাণিক আনুষ্ঠানিক ধর্মনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। তাই তিনি বলেন –

> "উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাকপৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।"[২]

অবশ্য আমরা জানি তিনি কিছুদিন ব্রহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। আবার ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। অবশ্যই এখানে তার নিজস্ব চিন্তাভাবনা ছিল না, শুধু পারিবারিক সংস্কারের প্রভাব ছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘ যাত্রার পর তাঁর নিজস্ব মতিগতির দ্বারা চালিত হয়ে যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে –

> "তাই সত্যের জীবন্ত রূপকে আড়াল করে চলার গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে আমি একদিন এই চার্চের সঙ্গে আমার সম্পর্কের ছেদ টানলাম।"[৩]

পরবর্তীতে প্রকৃতির মধ্যে এক লুক্কায়িত মহাসত্তার উপস্থিতি আবিষ্কার করেছিলেন, যাকে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। 'ব্রহ্ম সমাজের সার্থকতায়' তিনি বলেন –

> "ব্রহ্ম সাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মনুষত্বের কোন একটা চরম তাৎপর্য থাকে না।"[৪]

তাঁর ধর্মালোচনামূলক লেখাগুলোতে উপনিষদের বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে আমরা দেখেছি। সেখানে কোথাও উপনিষদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সের পরে উপনিষদ ও তপন ভিত্তিক আধ্যাত্ম সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হন, তা নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের কবিতার মাধ্যমেও তুলে ধরেছেন। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের ভাষণে একরকম উপনিষদেরই ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন যেখানে উপনিষদের মূলতত্ত্ব; ব্রহ্ম তত্ত্বই তাঁর মূল আলোচ্য।

উপনিষদে ব্রহ্মের ধারণা : বেদের ব্রাহ্মণ অংশের উপাঙ্গ অরণ্যকে যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপ থেকে দার্শনিক চিন্তার দিকে সংক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। অরণ্যকের শেষ ভাগ হল উপনিষদ। 'উপনিষদ' শব্দের মুখ্য অর্থ হল ব্রহ্মবিদ্যা। স্পষ্টতই উপনিষদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম। উপনিষদে আত্মা, চৈতন্য ও ব্রহ্ম অভিন্ন। উপনিষদের ঋষিগণ বৈচিত্র্যময় জগতের মধ্যে দেখেছেন পাহাড়-পর্বত, মানুষ, পশু-পাখি সবকিছুই যেন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবস্থান করে আছে। কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। এই সামঞ্জস্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপনিষদের ঋষিরা বৈচিত্র্যময় জগতের মধ্যে এক মূলসত্তাকে তথা ব্রহ্মকে কল্পনা করেন। বিশ্বজগতের বিভিন্নতার মধ্যে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, নিকটবর্তী-দূরবর্তী, বিগত-অনাগত সমুদয় বস্তু ও ঘটনা যেন এক অদ্বয় সত্যের প্রকাশ। সেই সত্য কোন চেতনসত্তা। উপনিষদে এই অদ্বয় সত্যকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

'জন্মদাস্যযতঃ' অর্থাৎ এই সবকিছুর জন্ম যা হতে হয়েছে, যাতে এই সবকিছুর স্থিতি এবং লয়, যিনি সব কিছুরই মূলাধার তিনিই ব্রহ্ম। উপনিষদের বিভিন্ন বাণীতে এ কথা বারবার বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩/১৪/১) বলা হয়েছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"[৫] 'যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থেকেই সব আসে, আবার ব্রহ্মেই ফিরে যায়। সব কিছুই ব্রহ্মকেই আশ্রয় করে আছে। অতএব শান্তভাবে ব্রহ্মকে ধ্যান করা উচিত।' ব্রহ্মই যদি সবকিছু হয় এবং জগতের সব কিছুই যদি ব্রহ্ম থেকেই আসে তাহলে জগতের উপাদান কারণ হবে ব্রহ্ম। তাই ব্রহ্ম এবং সৃষ্টির সম্পর্ক অতি নিগূঢ়। উপমাপ প্রয়োগ করে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। মানুষের দ্বারা নির্মিত একটি মাটির পাত্রের উপাদান হল মাটি এবং পাত্রের প্রকাশ হল তার বিশেষ রূপ। এখানে মূল বিষয় হল উপাদান এবং গৌণ বিষয় হল তার রূপ। উপাদানের বিকার থেকে তার গৌণত্বের বা বিশেষ রূপের প্রকাশ পায়। তাকে আলাদা করে নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।[৬] তাই বিশ্বজগতের মূল তত্ত্ব হল ব্রহ্ম আর এই বৈচিত্র্যময় জগৎ হল ওই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপের প্রকটিত অবস্থা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রহ্ম সম্পর্কে উপনিষদে দ্বৈতভাব এবং অদ্বৈতভাব, এই দুটি ভাবেরই প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের উপর যখন বিষয় ও গুণ আরোপ করা যায় না, তখন ব্রহ্মকে দ্বৈতভাবহীন রূপে পাওয়া যায়।

> "এই অবস্থায় ব্রহ্ম একদিকে অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, লক্ষণহীন, চিন্তা ও শ্রবণের অগম্য, এবং অপরদিকে তা বহিঃপ্রজ্ঞ নয়, অন্তঃপ্রজ্ঞ নয়, অপ্রজ্ঞ নয়।"[৭]

ব্রহ্মের এই অদ্বৈতরূপ হল অমূর্তরূপ। অমূর্তরূপ হিসেবে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্মের এই গুণহীন নিঃসঙ্গ অবস্থা সৃষ্টির দিকে ধাবিত করে। এই নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য ব্রহ্ম সৃষ্টিতে বিবর্তিত হলেন। এ বিষয়ে ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে 'আগে একমাত্র আত্মাই ছিল, পরে তিনি ইচ্ছা করলেন বিভিন্ন লোক সৃষ্টি করব।[৮] আবার ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বে একটি সত্তা ছিলেন, কিন্তু পরে ইচ্ছা করলেন আমি বহু হব, জন্মগ্রহণ করব। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন এবং সেই তেজ মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করল।[৯] নির্বিকার, নির্গুণ ব্রহ্মের কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করলেন, আনন্দ আস্বাদনের জন্য। সেজন্য ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলা হয়। রস বা আনন্দের আকর্ষণেই এই সৃষ্টি ধারা প্রবাহিত হয়, যাতে আছে জন্ম-মৃত্যু ও তাদের জড়িয়ে নানান রসানুভূতি। এ কারণেই অখণ্ড দৃষ্টিতেই বিশ্বরূপ প্রকট রূপ বা ব্রহ্মের মূর্তরূপ।[১০] উপনিষদে এই ব্রহ্মকে আত্মা বলা হয়েছে। মান্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে বহির্বিশ্বের সবকিছুই ব্রহ্ম আর ভিতরে এই আত্মাও ব্রহ্ম। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এই আত্মাকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। 'সেই যিনি এই পুরুষে আবার সেই যিনি ঐ আদিত্যে - তিনি উভয়ই এক।'[১১] প্রায় সব ক্ষেত্রেই উপনিষদে ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভিন্ন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্র ভাবনায় ব্রহ্মবাদ : শৈশব থেকে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি উপনিষদের বাণীর গভীর অর্থ অনুধাবন করতে না পারলেও তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার শুরুতে উপনিষদের বাণী গভীর শ্রদ্ধা্রসঙ্গে পাঠ করে অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। 'শান্তিনিকেতনে'র ভাষণমালার মধ্যে তিনি উপনিষদের বিভিন্ন বাণী উদ্ধৃত করে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর 'বিশ্ববোধ' শীর্ষক ভাষণটি বিশেষ লক্ষণীয়। আধ্যাত্মিক সাধনায় তাঁর মানসবৃত্তির পরিপক্কতার ক্ষেত্রে একদিকে ছিল উপনিষদ এবং অন্যদিকে ছিল প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেম, মানুষের সান্নিধ্য, জীবনের নতুন অভিজ্ঞতায়, যুক্তিবোধ প্রভৃতি মিলেমিশে ব্রহ্মভাবনার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা শামিল হয়। ব্রহ্ম বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের ভাবনা কতগুলি ধাপে ধাপে এগিয়েছে। কখনো দেখবো উপনিষদের ব্রহ্ম বিষয়ক কোন বাণীকে বিস্তর ব্যাখ্যা করে তাতে নতুন ব্যঞ্জনা সংযোজিত করেছেন। আবার কোথাও দেখবো নিজের অনুভূতিকে খানিকটা উপনিষদের উপরে আরোপ করেছেন। এভাবে ব্রহ্ম বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের ভাবনা উপনিষদীয় ধারণার সঙ্গে কিছুটা মিল থাকলেও স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে।

ব্রহ্ম ভাবনার প্রাথমিক অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বৈদিক পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্যিকরা প্রকৃতির মধ্যে এক অস্ফুট সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন। প্রকৃতি বিষয়ক তাদের বর্ণনা পড়লে মনে হয় বর্ণনার পিছনে যেন প্রকৃতির সর্বত্র একটা দেবতার প্রতি (সত্য) বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সেই দেবতার সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা যোগসূত্র তৈরি করা। রবীন্দ্রনাথ ও অনুরূপভাবে প্রকৃতির প্রতি গভীর প্রেমে প্রকৃতির মধ্যেই এক প্রচ্ছন্ন সত্তার উপস্থিতির ইঙ্গিত পেয়েছে এবং তাকে জানার জন্য আকুল হয়ে পড়েছেন। কবি নিজে তার প্রথম জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন –

> "আমার সেই অতীতের দিনগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় আমি যেন অজান্তে সেই সব বৈদিক পূর্বপুরুষদের দেওয়া পথ বেছে নিয়েছিলাম। আমার দেশের আকাশে যে একটি মহাসুদূরের আভাস আছে তার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি।"[১২]

এখানে 'মহাসুদূর' শব্দের দ্বারা কবি প্রচ্ছন্ন সত্তার কথা বলছেন। তিনি আরো বলেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "শরতের সকালে আকাশের কুয়াশা ঘন পর্দার ওপার থেকে নিঃশব্দ সূর্যের নয়নাভিরাম দৃশ্যে প্রাণ পুলকিত হয়ে উঠতো। সেই এক অবর্ণনীয় আবিষ্টভাবের মধ্যে দিয়ে জগৎ প্রকৃতির সঙ্গে আমার মনের একটা নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।"[১৩]

মেটো রাস্তায়, নদীর তীরে, বনের পথে চলতে চলতে তিনি বার বার অনুভব করেছিলেন কোনো সত্তার যেন উপস্থিতি।

> "ভোরের বেলা জেগে ছিলেম দেখেছিলাম কারে/ সেদিন চলে যেতে যেতে চমক লাগে।/ মনে হল বোনের কোণে হাওয়াতে/ কার গন্ধ জাগে।"[১৪]

প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সেই প্রচ্ছন্ন সত্তাই যে ব্রহ্ম, সে কথা তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ২/১৭ সংখ্যক মন্ত্রের অনুরূপে নানা ভাবে বহুবার অনুবাদ করেছেন। 'ব্রহ্মসমাজের সার্থকতা' রচনায় তিনি বলেন –

> "যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।"[১৫]

তিনি মনে করেন এই আগুন, জল, জড়, জীব, অর্থাৎ পার্থিব সবকিছুইকেই আমরা আমাদের ব্যবহারের বস্তু বলে জানি। সেজন্য আমাদের মন শুধু ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিরিখেই তাদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন -

> "আমাদের চৈতন্য সেখানে পরম চৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে বিশ্বব্যাপী চেতনার মধ্যে আহ্বান করছে।"[১৬]

বিশ্বব্যাপী এই চেতনাকে প্রাথমিকভাবে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তা এক উপলব্ধির বিষয়, কিন্তু তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সুক্ষ্ম থেকে স্থূল, পাহাড় থেকে পর্বত, নদী থেকে সমুদ্র, সমগ্র মহাবিশ্বে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এ প্রসঙ্গে রবিঠাকুর তার কবিতায় প্রকাশ করেছে –

> "এই তো তোমার অলোক ধেনু/ সূর্য তারা দলে দলে। কোথাও বসে বাজাও বেনু/ চরাও মহাগগন তলে।"[১৭]

এখানে আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র এবং পৃথিবীর সবকিছুই কে বেণুর (বাঁশি) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং বিশ্বচেতনাকে রাখাল ছেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাখাল ছেলেকে দেখা না গেলেও তার বাঁশির সুর অনুভব করা যায়, ঠিক তেমনি বিশ্বচেতনাকে দেখা না গেলেও সত্তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

বিশ্বব্যাপী এই চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ সব কিছুর নিয়ন্ত্রক রূপে কল্পনা করেছেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু সংযোগে বস্তুর উৎপত্তি আবার পরমাণু বিযুক্তিকরণে ধ্বংস, জীবন মৃত্যুর খেলা, প্রকৃতির একরূপতা নীতি, সবকিছুকে পরিচালনা করছেন এই প্রকৃতির মধ্যে লুকায়িত সত্তা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "চন্দ্র সূর্য এমনই ঠিক নিয়মে উঠছে অস্ত যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে, পাছে এক পলক ত্রুটি ঘটে ...এমনকি সেই মৃত্যু যার আনাগোনার কোন খবর নেই তাকেও জোড়হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয়।"[১৮]

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য; "আমার প্রার্থনা এই যে ভারত আজ সমস্ত পূর্ব-ভূভাগের হয়ে সত্য সাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি কিন্তু তার সাধন সম্পদ আছে। সেই সম্পদের জেরে সে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে।"[১৯] ভারতবর্ষের সাধনাভাণ্ডার, তার সত্যসম্বল হচ্ছে ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই সবকিছুইকে নিয়ন্ত্রণ করে। ওই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছেন –

> "বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন... সেই বিধান শাশ্বতকালের। আজ এক রকম কাল এক রকম নয়...।"[২০]

এই বিধান কোনো দেশের কোনো রাজার বিধান নয় যে সেই রাজা পরিবর্তন হলে বিধানও পাল্টে যাবে। প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে সত্তার অনুভব করা যায় সেই সত্তার বিধান। সত্তা ওই বিধান দ্বারা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। এই বিশ্বজগত যেন তারই রচিত শিল্প। বিশ্বচৈতন্য অসীম মমতা ও অশেষ করুণার জন্য এই জগত থেকে দূরে থাকতে পারেন না। তাই জগতের মধ্যে দিয়ে তার প্রেম, তার আনন্দ প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, এই পৃথিবীর বিশাল অঙ্গ যেন তারই লীলা প্রাঙ্গণ। তাই সবকিছুই তার অমোঘ নিয়মে চলে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসত্তাকে জানতে চেয়েছেন। আসলে প্রথমেই আসে পরিচিত। পরিচিতি পর্বে জ্ঞান সম্পৃক্ত হলে এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করার পরই আসে তার প্রতি ভালবাসা। রবিঠাকুর মনে করেন শুধু জ্ঞানেই মুক্তি নেই। ভালবাসা থেকে আসে ভক্তি, আর ভক্তি থেকে তাকে কাছে পাওয়ার ব্যাকুলতা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন -

> "জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়, সর্বত্র নমস্কার করা। বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রস হচ্ছে ভক্তি।... সমস্ত ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা- জীবনের এমন পরিপূর্ণতা, জগতবাসের এমন সার্থকতা আর কি হতে পারে!"[২১]

রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্ম বিষয়ক শুধু জ্ঞানের কথা বলছেন না, ভক্তি ভরে জ্ঞানের কথা বলছেন। জ্ঞানের থেকে ভক্তিকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। ভক্তির দ্বারা নিজেকে বিশ্বসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করাকে রবীন্দ্রনাথ চরম সার্থকতা বলে গণ্য করছেন। তাঁর আরো বক্তব্য হল –

> "আমরা ব্রহ্ম সাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলাম - তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম। তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্যাপ্ত করে তুলতে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোম্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছিল।"[২২]

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনার তৃতীয় পর্বে তিনি বিশ্বসত্তাকে ভালোবাসার সম্পর্কে নিজের কাছে পেতে চেয়েছেন। আমরা দেখেছি তিনি প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে বিশ্বসত্তাকে আবিষ্কার করলেন। পরে তাঁর অনুভব হল এই সত্তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। অতঃপর বিশ্বসত্তাকে সম্পর্কে জানলেন, শুধু জানা নয় বরং বিশ্বসত্তার সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক স্থাপনেই জীবনের স্বার্থকতা বলে মনে করলেন। এখন আমরা দেখবো - তিনি এই সত্তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের কাছে পেতেও চাইছেন। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে - 'তাঁর এই পাবার আকুতিই তাঁকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল'। উপনিষদে বিশ্বসত্তাকে নৈর্ব্যক্তিক সত্তা রূপে তুলে ধরা হয়েছে। যার মূর্ত রূপ কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। এমন সত্তার প্রতি ভক্তিও আসতে পারে না। তাই তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবাদ থেকে সরে এসে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। মানুষ নৈর্ব্যক্তিক কোন কিছু কল্পনা করতে পারে না, রূপের আশ্রয় তাকে নিতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবে আরো বেশি রূপমনস্ক, তাঁর অরূপরতন ও রূপনারায়ণের কূলে শেষ পর্যন্ত জেগে উঠে সমাসীন থাকেন। তাই ব্রহ্মধর্ম নির্দেশিত হয়ে কবি ব্রহ্মসংগীতগুলো রচনা করলেও তার প্রেম দর্শন অনেকটা স্বাধীন ও আনন্দময়। ঈশ্বর হল প্রেম স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই জগত সংসার এই কর্মক্ষেত্র; এখানে জগতমণ্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 98
Website: https://tirj.org.in, Page No. 862 - 871
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> জ্ঞান, জগতের সৌন্দর্য ভোগে ঈশ্বরের ভোগ এবং জগতের সংসারের কর্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে।"[২৩]

এখানে রবীন্দ্রনাথ কর্ম, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান এবং সৌন্দর্য ভোগকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুল্য মনে করছেন। এই ঈশ্বরের অনন্ত গুণের মধ্যে যে গুণটি বিশেষভাবে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে তা হল প্রেম। প্রেমময় এই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন। এই প্রেম মুক্ত ও স্বাধীন বলে ঈশ্বরও স্বাধীন। প্রেমময় ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলে আমাদের সকল ইচ্ছার পরিপূর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোন প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করেছেন। তিনিই প্রেম স্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন- সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ।"[২৪]

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে নিজের কাছে পাওয়ার জন্য কতগুলি সম্পর্কের কথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন। কিরূপ সম্পর্কে তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত হলে ভাবের আদান-প্রদান, দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক সবচেয়ে ভালো হবে বা কিরূপ সম্পর্কে স্থাপন করলে একে অন্যের মধ্যে বিলীন হওয়া যাবে, তাই নিয়েই কবির ভাবনা। তাঁর মতে কোন সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনভাবে ঈশ্বরকে পেলে তিনি কেবল দর্শনের তত্ত্বের মতো আমাদের কাছে থাকবে, কোন আপন হবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

> "আমরাও যেসকল সম্বন্ধ দিয়া ঈশ্বরকে ধরবো তা একরকম নয়। আমরা তাকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি।... সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ।"[২৫]

পুত্র যত ছোট হোক বা পিতা যতই বড় হোক না কেন পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্ক অনেক গভীর থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ পিতা-পুত্রের সম্পর্কে ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন। পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ তার সাধনার পথে গভীর মননশীলতার সঙ্গে সাধনায় লব্ধ উপলব্ধির পরিণত রূপটি আবিষ্কার করেছিলেন। তখন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পিতারূপী ঈশ্বরের সঙ্গে গভীরভাবে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ তিনি সাম্যের ভিত্তিতে ঈশ্বরকে পেতে চাইছেন। পিতা বড় পুত্র ছোট, একদিকে ভক্তি অন্যদিকে স্নেহ। তাই পিতা-পুত্রের সম্পর্কে সাম্য থাকতে পারে না। বরং বন্ধুর সম্পর্কে একে অন্যের মধ্যে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে। এভাবে রবীন্দ্রনাথ গভীর প্রেমের সম্পর্কে নিজের মধ্যেই খুঁজে পেলেন ঈশ্বরকে যা 'জীবনদেবতা' নামে পরিচিত। 'আমার অন্তরে এমন কেউ আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সর্বকালীন মানব, সেই মানুষকে ব্যক্তিমানুষ নানা ভাবে ও নানা নামে পূজা করেছে এবং সেই সর্বজনীন মানব। সেই দেবতা।' এই জীবনদেবতা ব্যক্তি বিশেষের অন্তরে থেকে তার জীবনকে পরিচালিত করে। এই দেবতার ইচ্ছা অনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাই কর্তব্য বলে তিনি মনে করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব নাট্যাভিনেতা ও নাটকের নির্দেশকের মতো। কিভাবে অভিনয় করতে হয় সেটা নির্দেশক যেমনভাবে শিখিয়ে দেয় অভিনেতা তেমনই অভিনয় করে। সেরকম জীবনদেবতাও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে দিয়ে তার ইচ্ছার পূরণ করেন। একেই রবীন্দ্রনাথ 'সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বসত্তা দুই পর্যায়ে প্রকাশ হতে পারে। এক পর্যায়ে তিনি সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন নিয়ামক শক্তি, এটা যেন বিশ্বসত্তার কাজের প্রকাশ। এখানে বিশ্বসত্তা যেন বিশ্বদেবতা। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বসত্তা প্রকাশিত হয় ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, তার হৃদয়ের জীবনদেবতা রূপে। বিশ্বসত্তার কাজের প্রকাশ অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রতি মানবিক হয়ে পরের জন্য কর্ম করার ফলে আনন্দবোধ জাগরিত হয়। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বিশ্বমানবতার তত্ত্ব গড়ে তোলেন।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কয়েকটি দিক : এই পর্বে আমরা ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাণীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিল ও অমিলের ক্ষেত্র বলার চেষ্টা করব। উপনিষদে দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ উভয় স্বীকার করা হয়েছে। কঠ

উপনিষদে বিশ্বজগতকে সুবিশাল ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই বিশাল ক্ষেত্রকে পরিদর্শন করার জন্য মানুষের মন যেন ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব রথে চড়ে বিচরণ করছে। ভোক্তা এবং ভোগ্যবিষয়, এই দ্বৈতভাব না থাকলে বিশ্বরূপ কখনোই প্রকাশিত হতো না। মান্ডুক্য উপনিষদে ব্রহ্মের দুটি অবস্থার কথা উল্লেখ আছে; অদ্বৈত অবস্থা এবং দ্বৈত অবস্থা। দ্বৈত অবস্থায় ভোক্তা এবং ভোগ্য এই দুটি ভাব থাকে। অদ্বৈত অবস্থায় ভোক্তা-ভোগ্য, এই ভাব থাকে না। ব্রহ্ম অদ্বৈতভাবে অবস্থান। আত্মা বা ব্রহ্মের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা হল দ্বৈতবস্থা এবং তুরীয় অবস্থায় ব্রহ্মের অদ্বৈতভাব প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন অদ্বৈতভাব থেকে দ্বৈতভাব গড়ে উঠেছে। তার এই অদ্বয়বোধ দ্বৈতবোধের পরিপন্থী নয়। কারণ দ্বৈতবোধের যাত্রা শুরু হয়েছে অদ্বয়বোধ থেকে। উপনিষদের মত রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যেও দ্বৈতসত্তা খুঁজে পেয়েছেন; একটি আত্মা, আর অপরটি হল আত্মার সাহচর 'অহং'। যাকে আত্মার বাহ্যিক রূপ বলা যেতে পারে কারণ তা আত্মাকে অবলম্বন করে দেশ-কালে বারবার উদ্ভূত হয়েছে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতনে'র 'নদী ও কূল' শীর্ষক লেখায় বলেন –

> "আমার আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মত যে নিয়ত লেগেই রয়েছে।"[২৬]

অন্যান্য দ্বৈতবাদীদের থেকে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদ এর পার্থক্য হল - রবীন্দ্রনাথ 'তুমি' ও 'আমি'র ধারণাকে অন্যান্য দ্বৈতবাদীগনের মত নিত্য ও স্থির বলেননি। তাঁর মতে আমির ধারণা কোন স্থির পরমসত্তার ধারণা নয়, 'আমি' বাস্তব জীবনের নতুন অভিজ্ঞতায় ক্রমশ সম্পৃক্ত হয়ে এক ব্যক্তি-সত্তার ধারণা লাভ করেছে। 'আমি' ও 'তুমি' মিলিয়ে নিত্যকালে সকল সত্য হয়ে উঠেছে। উপনিষদের দ্বৈতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদের আরেকটি পার্থক্য হল; উপনিষদে দুটি সত্তার কোন একটি সত্তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, দুটির ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের বৈচিত্রময় প্রকাশের ক্ষেত্রে মানুষের মনকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। বিশ্বশিল্প রচনায় মানুষের মন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। এমনকি তাঁর মতে মন না থাকলে এই বৈচিত্রময় বিশ্বজগৎ রচিতই না।

যখনই দ্বৈতবাদের প্রসঙ্গ আসে তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে আরো একটি প্রশ্ন ওঠে-কেন এই দ্বৈতসত্তা? কেন এই সৃষ্টি? আমরা আগেও দেখেছি বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত রূপের কল্পনা করা হয়েছে। ঐতিরেয় উপনিষদে দেখেছি বিভিন্ন লোক সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো নিজ ইচ্ছা। 'ইচ্ছার' কারণ আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা। আনন্দ আস্বাদনের জন্য তিনি সৃষ্টি প্রবাহে রূপান্তরিত হলেন। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করা। এই আনন্দ আস্বাদনের জন্যে যিনি এক ছিলেন তিনি বহু দ্বারা বিচিত্র বিশ্বরূপে রূপান্তরিত হলেন। গীতাঞ্জলির একটি কবিতায় তিনি বলেছেন 'জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ, ধন্য হল ধন্য হল মানব জীবন'। এক্ষেত্রে উপনিষদ ও রবীন্দ্র দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়েছে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে যতটুকু পার্থক্য আছে তা হলো প্রকাশভঙ্গির উপরে। উপনিষদে বিমূর্ত আকারে ভাষায় রূপ পেয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের কোথাও খেলা, কোথাও নৃত্য, ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করে আনন্দতত্ত্ব ও সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সৃষ্টি যখনই হয়েছে তার ধ্বংস অনিবার্য। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপে অধিষ্ঠিত অবস্থায় সৃষ্টি প্রবাহ নেই তাই জন্ম-মৃত্যু নেই, সুখ-দুঃখ জীবন মরণের ঊর্ধ্বে। দ্বিতীয় অবস্থায় ব্রহ্ম যখন বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয় সেক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষ নিজের স্বার্থবোধ থেকে যখন মৃত্যুকে দেখে, তখন সে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। উপনিষদে একে অবিদ্যা প্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একে 'ছোট আমি'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। তৃতীয় অবস্থা হল একাত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গি। সৃষ্টি যেহেতু অখণ্ড মহাসত্তার প্রকাশ তাই এখানে মৃত্যুতে মানুষ দুঃখ পায় না, সবকিছু যেন আনন্দময়। গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মৃত্যু মানুষকে পূর্ণতা দান করে। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে উপনিষদের মতো একাত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে বিশ্বসত্তা বিশ্বরূপে প্রকাশ নিয়েছেন আনন্দের স্বাদ নেওয়ার জন্য, তাই পৃথিবীতে জন্ম-মৃত্যু উভয়েই জড়িয়ে রয়েছে আনন্দ। এখানে কোন দুঃখ নেই। মৃত্যু চেতনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের তেমন একটা পার্থক্য নেই।

রবীন্দ্রনাথ কাব্য, সাহিত্য, ও দর্শনের সুবিশাল বটবৃক্ষ স্বরূপ, যদিও তিনি নিজেকে দার্শনিক বলে পরিচয় দেননি। আমাদের মনে হয় উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনকালেই যদি পরিচয় না হত, তাও আমরা তাঁর লেখায় এমন অনেক

উপাদান পেতাম যা উপনিষদের বাণীর সঙ্গে নিগূঢ় মিল থাকত। কেননা কবির নিজের ধর্ম বিশ্বাস বাহ্যিক কোনো কিছুর প্রভাবে গড়ে ওঠেনি, কবির নিজের প্রসূত থেকেই তাঁর ধর্ম বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। উপনিষদের বাণীর সঙ্গে কবির প্রকৃতি প্রেম, বাস্তব অভিজ্ঞতা মিলেমিশে ব্রহ্ম ভাবনা সম্পৃক্ত হয়েছে। সত্তার সন্ধানে উপনিষদের মধ্যে যেমন আমরা দেখেছি, বহির্বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত এক সত্তাকে আবিষ্কার করা এবং সেই সত্তাকে আমাদের ভিতরকার আত্মার সঙ্গে অভিন্ন উপলব্ধি করা। এখানে ব্রহ্মকে অবলম্বন করে আত্মা ও অনাত্মা যেন এক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথও সেই পরম একের সঙ্গে যোগ হয়ে নিজের মধ্যে বিশ্বকে অনুভব করেছেন অথবা বিশ্বের মধ্যে নিজেকে অনুভব করেছেন। আমরা দেখেছি এরকম কয়েকটি ক্ষেত্রে উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদের মিল আছে। তবুও অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বহন করে। যাকে উপনিষদ ও বিভিন্ন বৈদান্তিকদের মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মতবাদ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মতত্ত্ব পুরোপুরি উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে মেলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা তত্ত্ব উপনিষদে সঙ্গে নেই। তবুও একথা আমরা বলতে পারি যে, জীবনদেবতাতত্ত্ব আসলে বিমুর্ত ব্রহ্মবাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের ব্যক্তিরুপী ঈশ্বরের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের এক অভিনব পরিকল্পনা। তাছাড়া মানবতাবাদের প্রসঙ্গ যদি আমরা দেখি সেখানে দেখব, - ‘সকল বস্তুই যে এক মহাসত্তার প্রকাশ’ এই বোধই উপনিষদের মানবতাবাদী তত্ত্বের প্রেরণা। তাই উপনিষদের মানবতাবাদী তত্ত্ব এসেছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে অখন্ডতাবোধ ও ঐক্যবোধ থেকে। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ গড়ে উঠেছে উপনিষদের মতো অখণ্ডতাবোধ এবং ‘ঈশ্বরকে নিজের জীবনে ভালোবাসার মাধ্যমে পাওয়া যাবে’- এই বোধ থেকে। ঈশ্বরকে পেতে গেলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও সমগ্র পৃথিবীর প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। আবার শংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পুরোপুরি মিল নেই, কারণ শংকরাচার্য জগতের প্রকৃত সত্তা স্বীকার করেননি। তিনি জগতকে মায়ার দ্বারা সৃষ্ট বলেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দর্শনে মায়াবাদ স্বীকৃত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মতে বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি অপূর্ব সুন্দর। আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্তে এ সৃষ্টি কখনোই মায়া বা অবিদ্যা প্রসূত হতে পারে না। রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম তত্ত্বের সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ রামানুজ ব্রহ্মকে সত্য বলেছেন এবং জীব ও জড়কে বা চিৎ ও অচিৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বলেছেন। ব্রহ্ম যেহেতু নিত্য তাই ব্রহ্মের অংশ হিসেবে চিৎ ও অচিৎ নিত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ‘আমি’কে নিত্য বা স্থির বলেননি। ‘আমি’ নানা রঙের জগতে, বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার সাপেক্ষে নিত্যনতুন প্রবাহে পূর্ণ ব্যক্তিসত্তার ধারণা লাভ করে। আবার বল্লভাচার্যের শুদ্ধ অদ্বৈতবাদী তত্ত্বের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্ম চিন্তার পার্থক্য আছে। বল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের চিৎ ও আনন্দ গুণ তিরোহিত হলে ব্রহ্ম জগৎ রূপে পরিণত হয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন ব্রহ্ম জগতের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পান। মধ্যাচার্যের দ্বৈতবাদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচিন্তার পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করি; মধ্যাচার্যের দ্বৈতবাদে জীব ও জগতকে ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য বলা হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা বলেননি। তাই অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবাদকে উপনিষদ ও বৈদান্ত্রিকদের ব্রহ্মবাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি ‘ব্রহ্মবাদ’ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, *উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ.* কলকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, 1959. পৃ. ৪৪ - ৪৫

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়.* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২. পৃ. ৮৬

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান.* বাংলা অনুবাদ, সেনগুপ্ত শংকর, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪. পৃ. ১০১

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ব্রহ্মসমাজের স্বার্থকতা’, *শান্তিনিকেতনে.* দ্বিতীয় খন্ড. কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯৭৫, পৃ. ১৪১

৫. লেকেশ্বরানন্দ, স্বামী, *উপনিষদ : ছান্দোগ্য উপনিষদের শংকর ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাখ্যা.* দ্বিতীয় ভাগ, শ্লোক সংখ্যা ৩/১৪১, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ. ১৩৫

৬. তদেব, শ্লোক সংখ্যা ৬/১/৪, পৃ. ২৪৯

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, 1959, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৮. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, 'ঐতরেয়োপনিষদ', *উপনিষদ গ্রন্থাবলী.* শ্লোক সংখ্যা, ২।। ১, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ৩৫১

৯. লেকেশ্বরানন্দ, স্বামী, ২০১২. প্রাগুক্ত, শ্লোক সংখ্যা ৬/২/৩, পৃ. ২৫২

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, 1959, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

১১. গম্ভীরানন্দ, স্বামী, 'তৈত্তিরীয় উপনিষদ', ১৯৬২, প্রাগুক্ত, শ্লোক সংখ্যা, ৩/১০/৪, পৃ. ৩৫২

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান,* ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

১৩. তদেব, পৃঃ, ৮৫

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, '*গীতিমাল্য*, ৫, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৬, পৃ. ৮

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ব্রহ্মসমাজের স্বার্থকতা', *শান্তিনিকেতনে,* ১৯৭৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১৬. তদেব, পৃ. ১৪০

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *গীতিমাল্য,* ১৯৪৬, প্রাগুক্ত, গীত সংখ্যা, ১০৩, পৃ. ১২৪

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কর্মযোগ', *শান্তিনিকেতন,* ১৯৭৫, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শিক্ষার মিলন,* কলকাতা, ১৩২৮, পৃ. ২২ https://archive.org/details/dli.ministry.26894

২০. তদেব, পৃ. ৫

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ব্রহ্মসমাজের স্বার্থকতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০ - ১৪১

২২. তদেব, পৃ. ১৪১

২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *উপনিষদ ব্রহ্ম.* কলকাতা, আদি ব্রহ্মসমাহ যন্ত্রে, ১৩৮০, পৃ. ১৮ https://upload.wikimedia.org

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'প্রেম', *শান্তিনিকেতন.* প্রথম খন্ড, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃ. ২৬

২৫. তদেব, 'নমস্তেহস্তু', পৃ. ৩১৫

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নদী ও কূল', *শান্তিনিকেতন.* প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০